আবরার হত্যা ও শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

| ঢাকা , শনিবার, ০২ নভেম্বর ২০১৯

বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ সতীর্থদের নির্মম প্রহারে নিহত হন। আবরার মৃত্যুতে সারা দেশই শোকাহত। এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা করতে পারে এই বিষয়টি ভাবতেও অবাক লাগে। বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, আবরার ফাহাদ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে ফেসবুকে ভিন্নমত পোষণ করায়, তিনি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের রোষানলে পড়েন। এই অপরাধে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতারা তাকে দণ্ডিত করে হত্যা করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৈশাচিকতায় উন্মত্ত হয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আবরার ফাহাদকে হত্যা করে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ফাহাদের ওপর যে পৈশাচিকতা চালায় তা ৭১-এর পাকিস্তানি হায়েনার নির্যাতনকেও হারায় মানায়। আলজাজিরাসহ আন্তর্জাতিক কিছু গণমাধ্যমে আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডের খবরটি প্রচার করে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর খবরেও

বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি ভারত সফরের সম্পাদিত চুক্তিতে আবরার ফাহাদ ভিন্নমত পোষণ করে ফেসবুকে মন্তব্য প্রকাশ করে স্ট্যাটাস দেয়। এই স্ট্যাটাসের অপরাধে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে হত্যা করে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছে। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে এই হত্যাকাণ্ডটি প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। সাধারণ মানুষের মনে এখন প্রশ্ন, সরকারের কোন কর্মকাণ্ডকে কি সাধারণ মানুষ সমালোচনা করতে পারবে না? যদি আবরার ফাহাদ ৫৭ ধারার পরিপন্থি কোন তথ্য ফেসবুকে প্রচার করে থাকে, তাহলে তাকে দেশের ৫৭ ধারার আইনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতারা দেশের প্রচলিত আইনে তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। কোন মানুষকে তার মত প্রকাশের দায়ে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা যায় কি? এ ধরনের অমানবিকতার কারণে দেশের ছাত্র রাজনীতি থেকে মেধাবীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। দেশের গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতির অনুশীলনের ক্ষেত্রটি যে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ মিলল এই হত্যাকাণ্ডটির মধ্য দিয়ে। ইচ্ছা থাকলেও মানুষ আর স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করবে না। আবরার ফাহাদকে জামায়াত শিবির বিএনপির কর্মী বলেও চালিয়ে দেয়ার একটি অপচেষ্টা চলেছিল বলে, অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

কুষ্টিয়ার জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা আবরারের পরিবারকে জামায়াত বানাতে চেয়েছেন। আবরারের বয়স কত হবে, আনুমানিক ১৯-২০। বর্তমান সরকার ১১ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। এই সরকার যখন ক্ষমতায় বসেন তখন আবারারের বয়স আনুমানিক ৯-১০। ৯-১০ বছর বয়সে কোন মানুষের মনে রাজনৈতিক মতাদর্শ জন্ম নেয় না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শের ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা যায় যে, আবরারের যে পরিবারে জন্ম সেই পরিবারটি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একটি পরিবার। সুতরাং আবরারের ভিন্ন আদর্শের ছাত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কোন সময়েই। তাই আবারার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের বা রাজনৈতিক বলয়ভুক্ত করাটা হবে এক ধরনের অপরাধ। ইতোমধ্যেই আবরার হত্যার সঙ্গে জড়িতদের ছাত্রলীগ বহিষ্কার করেছে। ছাত্রলীগ আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে শোক র‍্যালি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

বুয়েট হলো দেশের মেধাবীদের বিদ্যাপীঠ। সারা দেশে উচ্চমাধ্যমিক এবং এর সমমান পাস করে প্রতি বছর প্রায় ১৭-১৮ লাখ শিক্ষার্থী। এই শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মেধাবী ছয় থেকে ৮শ' জনের মতো বুয়েটে পড়ার চান্স পান। তাই বুয়েট হলো দেশের সেরা মেধাবীদের শিক্ষালয়।

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ হলো দেশের সেরা মেধাবীদেরই নিরাপত্তা নাই। বুয়েটের হলগুলোতে রয়েছে টর্চার সেল। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে হচ্ছে টর্চার বা শারীরিক নির্যাতন চর্চা। বুয়েটের ভিসি হল প্রভোস্ট এবং প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা কি এই টর্চার সেলের বিষয়ে জানতেন না। যদি না জানেন তাহলে ধরে নিতে হবে তারা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। আবরার ফাহাদের মৃত্যুর ওপর গণমাধ্যমে হলগুলোর টর্চার সেলগুলো দৃশ্যমান হয়। যেদিন আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সেই দিন রাত সাড়ে ৩টায় প্রভোস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক শেরে বাংলা হলে আসেন। তারপর দিনের সূর্য উঠার পর তাদের আর দেখা যায়নি। কোন অজ্ঞাত কারণে তারা গাঢাকা দিয়েছিল তা জানা দরকার। দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন প্রতি হলে টর্চার সেল বানাচ্ছে-এটা কি শিক্ষকরা জানতেন না। তারা যদি সম্মিলিত প্রতিবাদ করতেন তাহলে কোন দলই ক্ষমতায় গিয়ে এ ধরনের টর্চার সেল বানাতে পারতো না। দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে নাকি রয়েছে এরকম টর্চার সেল। এই টর্চার সেলগুলোতে র‍্যাগিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক নির্যাতন করা হয়। র‍্যাগিংয়ের নামে কোন শিক্ষার্থীকে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা ফৌজদারি অপরাধ। এ ধরনের অপরাধকারীকে যেমন সাজা দেয়া উচিত ঠিক তেমনি আশ্রয়-

প্রশ্রয়দাতা হল প্রভোস্টদের শাস্তির আওতায় আনা দরকার। আবরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় ইতোমধ্যেই ১৬ জনকে পুলিশ আটক করেছে। সেই ১৬ জনের সঙ্গে শেরে বাংলা হলের দায়িত্বে যারা ছিল তাদের আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসবে। দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হত্যার বিচার যথাসময়ে হয় না। এ ধরনের হত্যা মামলা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। হত্যা মামলাগুলোর দীর্ঘসূত্রতার কারণ হিসেবে আইনজীবীরা বলছেন, সাক্ষী এবং মামলার অন্যান্য আলামত যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন করা যায় না বলেই বছরের পর বছর মামলাগুলো চলতে থাকে। যার জন্য এর কোন নিষ্পত্তি হয় না।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সবকটিই আবাসিক, সুতরাং একজন শিক্ষার্থী যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তার দেখাশোনার সব দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী খুন হলে তার বিচারিক বিষয়গুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করা কর্তা ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেখে হতবাক হতে হয়। আবরার নিহত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত কর্মকর্তা রাত সাড়ে ৩টায় এসেছিলেন তারা কেন পুলিশকে খবর দিলেন না। বুয়েট কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে কেন মামলা করেন নাই? কেন আবরারের বাবাকে বাদী হয়ে মামলা করতে

হলো? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যা মামলাগুলোর দীর্ঘসূত্রতার আরেকটি কারণ হিসেবে আইনজীবীরা দেখছেন, সাক্ষী এবং বাদী দূরে থাকার কারণে, মামলার তারিখের দিন যথাসময়ে হাজির হতে পারে না তাই মামলার তারিখ পিছিয়ে যায়। আবরারের বাবা থাকেন কুষ্টিয়ায় আর মামলাটি ঢাকায়, সুতরাং বাদী দূরে থাকার কারণে যথাসময়ে তার পক্ষে উপস্থিত হওয়াটাই অসম্ভবও হতে পারে। তাহলে কি আবরার হত্যা মামলাটিও যথাসময়ে নিষ্পত্তি হবে না, দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যা মামলার ন্যায় ঝুলে থাকবে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যা মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, এ মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বেড়ে যায়। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। যে কোন ধরনের ঘটনার দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। সরকার দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বড় বড় কলেজগুলোর আবাসিক হলগুলোতে তল্লাশি চালাবেন। যে সব হলগুলোতে এ ধরনের টর্চার সেল পাওয়া যাবে সেই সব হলগুলোর প্রভোস্ট এবং হল কর্মকর্তাদের প্রশ্রয় এবং মদতদাতা হিসেবে ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা দরকার। আমরা প্রায় শুনি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবাধে অস্ত্র

নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মদত না থাকে তাহলে কোন ক্ষমতাই ছাত্র সংগঠন অবাধে এ ধরনের অপকর্ম করতে পারে না। তাই সর্ষের ভূত আগে ছাড়াতে হবে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দয়িত্ব পালনকারীদের হতে হবে নিরপেক্ষ, কর্তৃপক্ষ যদি রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিরাপদ হবে না।